দিনবদলের সনদ: প্রাপ্তি ও অগ্রগতি

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১১ অক্টোবর, ২০১০)

আওয়ামী লীগ 'দিনবদলের' অঙ্গীকারের ভিত্তিতে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল সংগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে। এরই মধ্যে সরকারের এক-তৃতীয়াংশ মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নে কতটুকু অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে – অনেক নাগরিকের মনেই আজ এ প্রশ্ন। তাই সরকারের সফলতা-ব্যর্থতা নিয়ে একটি মূল্যায়ন জরুরি। এ উদ্দেশেই আজকের এ আলোচনা। আমাদের মূল্যায়নটি প্রাথমিক ও মূলত গুণগত, সংখ্যাগত নয়।

দিনবদলের সনদে মোট ২৩টি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয়, যার মধ্যে পাঁচটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের খাতগুলো হলো: দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও বিশ্বমন্দার প্রভাব মোকাবিলা; দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা; বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ; দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসন; সুশাসন প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ এ পাঁচটিই হলো আওয়ামী লীগের দিনবদলের সনদের ভরকেন্দ্র এবং এগুলোই সর্বপ্রথম অর্জন করার কথা।

অঙ্গীকার	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
১. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও বিশ্বমন্দার মোকাবেলা	
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম কমিয়ে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনা এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখা।	নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হয়নি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অতি মাত্রায় বেড়েছে। যেমন, *প্রথম আলোর* (৫ অক্টোবর, ২০১০) একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী: 'সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)-এর হিসেবে গত এক বছরে দেশের গরীব মানুষের প্রধান খাদ্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। যেমন– সাধারণ মানুষের তিনবেলার প্রধান খাদ্য চাল ও আটার দাম বেড়েছে প্রায় ৪৪ ও ৫২ শতাংশ করে। আবার মধ্যবিত্তের চিকন চালের দাম বেড়েছে ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ। ভোজ্য তেলের মধ্যে সয়াবিন ১৮ ও পাম তেলের দাম বেড়েছে ৩৫ শতাংশ।'
মজুদদারী ও মুনাফাখোরি সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দেয়া এবং চাঁদাবাজি বন্ধ করা।	সিন্ডিকেট নিয়ে অনেক অভিযোগই শোনা যায়, কিন্তু তা ভাঙ্গার ব্যাপারে সরকারের সফলতা দৃশ্যমান নয়। তবে আমরা শুনেছি যে, চালের মূল্য বাড়ার প্রতিক্রিয়ায় কয়েক শ' চালকলের নিবন্ধন বাতিল করা হয়। চাঁদাবাজির খবরও প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে।
'ভোক্তাদের স্বার্থে ভোগ্যপণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ' সৃষ্টি।	সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোনো উদ্যোগের কথা আমরা শুনিনি।
বিশ্বমন্দার প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা এবং একটি টাস্কফোর্স গঠন।	তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা এবং কোনো টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে বলে আমরা শুনিনি। তবে সরকারের পক্ষ থেকে রপ্তানীখাতের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা এবং এর ভিত্তিতে তাদেরকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বমন্দার কারণে বিদেশে কর্মরত যে সকল শ্রমিক চাকুরি হারিয়ে দেশে ফিরে এসেছে, তাদেরকে কোনোরূপ সহায়তা প্রদান করা হয়নি।
জনশক্তি রপ্তানী অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	জনশক্তি রপ্তানীর ক্ষেত্রে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তবে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০০৮ সালে ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার শ্রমিক বিদেশ গেলেও ২০০৯ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৪ লক্ষ ৭৫ হাজারে। গত ৭ বছরের মধ্যে ২০১০ সালে সবচেয়ে কম বাংলাদেশী শ্রমিক চাকুরি নিয়ে বিদেশে গিয়েছে বলে গণমাধ্যমে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে (*আমার দেশ*, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১০)।
২ দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা	
দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে কমিশনকে শক্তিশালী করা।	আইন সংশোধনের মাধ্যমে দুদককে রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ করা, সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি গ্রহণে বাধ্যবাধকতা, সরকার কর্তৃক সচিব নিয়োগ ও তাকে মূখ্য হিসাব কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন, মিথ্যা মামলার ক্ষেত্রে বাদীর জেল-জরিমানার বিধান, স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুদককে স্বীকৃতি না দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত মন্ত্রীপরিষদে গৃহীত হয়েছে। দুদক চেয়ারম্যানের মতে, এর ফলে প্রতিষ্ঠানটি নখ ও দন্তহীন বাঘে পরিণত হবে।
ক্ষমতাধরদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণ দেওয়া।	মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বারবার ঘোষণা সত্ত্বেও ক্ষমতাধররা বার্ষিক সম্পদের বিবরণী প্রদান করেননি।
রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরের ঘুষ, দুর্নীতি উচ্ছেদ করা।	তদন্তের ভিত্তিতে সংসদের সাবেক স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার ও চীফ হুইপের দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলেও, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি শুধুমাত্র দুদকের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। সাবেক স্পীকারের দুর্নীতির কারণে সংসদের মর্যাদাহানির অভিযোগে 'সংসদীয় বিশেষ অধিকারে'র আওতায় তাঁর বিরুদ্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য যে, এমন অপরাধের জন্য প্রতিবেশি ভারতসহ অন্যান্য দেশে সংসদ থেকে বহিস্কার করা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে বড় ধরনের একজন দুর্নীতিবাজের শাস্তি হয়েছে বলে আমরা শুনিনি। দলীয় নেতাকর্মীদেরকে ফায়দা প্রদানের লক্ষ্যে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক প্রকাশ্য দরপত্র আহ্বানের বিধান রহিত করা হয়। এ ধরনের ফায়দাতন্ত্র ও দলতন্ত্রের চর্চা দুর্নীতিরই নামান্তর।
চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, কালোটাকা ও পেশীশক্তি প্রতিরোধ ও নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ।	চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী ও সরকারী উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিরা বারবার কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আসছেন। কিন্তু দলীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এগুলোর লাগামহীন বিস্তার অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে।

প্রতি দফতরে নাগরিক সনদ স্থাপন।	এ ধরনের কোনো উদ্যোগের কথা আমরা শুনিনি।
সরকারি কর্মকাণ্ডের ব্যাপকভাবে কম্পিউটারায়ন করে দুর্নীতির পথ বন্ধ করা হবে।	ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হলেও, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতি উচ্ছেদের তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না। এমনকি সকল মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটও নিয়মিতভাবে আপডেট করা হয় না।
৩ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ	
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সমস্যা সমাধানে একটি দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত জ্বালানী নীতিমালা গ্রহণ করা। ২০১৪ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যা সমাধানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।	*বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন* ৩ অক্টোবর সংসদে পাশ হয়েছে। যার ফলে সরকারের পক্ষে বিদেশ থেকে বিদ্যুৎ বা জ্বালানীর আমদানি ও তা সরবরাহ করা সম্ভব হবে। তবে এই কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্টদেরকে দায়মুক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের দায়মুক্তির ফলে সরকারি ক্রয়খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুটের সমপরিমান এলএনজি আমদানি করার প্রক্রিয়া চলছে। তবে বর্তমানে গ্যাসের সংকট চরম। উদাহরণসরূপ, চট্রগ্রামে ১৫০ মেগাওয়াটের একটি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পরই গ্যাসের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়।
২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা।	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সমস্যা সমাধানের বিষয়টিকে অগ্রাধিকারে পরিণত করা হয়েছে। সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের সময়ে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল আনুমানিক ৪০০০ মেগাওয়াট। গত দেড় বছরে প্রায় ৯০০ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু পুরোনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে বিদ্যুতের মোট উৎপাদন বাড়ছে ধীর গতিতে। তাই বর্তমানে চাহিদার তুলনায় বিদ্যুতের ঘাটতি ১০০০ মেগাওয়াটেরও বেশি। সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী, ডিসেম্বর পর্যন্ত আরও ৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যোগ হবে। ফলে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৫০০০ মেগাওয়াটে রূপান্তরিত হবে। তবুও বিদ্যুৎ পরিস্থিতি সহনীয় হতে আরও বছর দুই সময় লাগবে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা (*প্রথম আলো*, ৬ অক্টোবর, ২০১০)। বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিনিয়োগের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা প্রদর্শন করা হয়েছে, যা বাস্তবসম্মত নয় বলে অনেকের ধারণা। এছাড়াও অনেকগুলো বিদ্যুৎ কেন্দ্রই পুরোনো, তাই ভবিষ্যতে অনেক বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।
৪ দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসন	
কৃষি ও পল্লী জীবনে গতিশীলতা আনা হবে। বয়স্ক ভাতা, দুস্থ মহিলা ভাতা, সুবিধাভোগীদের সংখ্যা কমপক্ষে দ্বিগুন করা। তরুণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা। বর্তমানের ৬.৫ কোটি দরিদ্রের সংখ্যা ২০১৩ সালে ৪.৫ কোটিতে নামিয়ে আনা।	কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং সারের দাম কমানোসহ কৃষিখাতে ভর্তূকী প্রদানের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বল্পসূদে, সহজ শর্তে ও সহজে কৃষকদের ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ১০ টাকার বিনিময়ে ১ কোটি ৮২ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা শুরু হয়েছে এবং ৯২ লক্ষ বর্গাচাষীকে ডিজেল ক্রয়ে সহায়তা বাবদ ৭৫০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। গত অর্থ বছরে এপ্রিল পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারিখাতে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৮ হাজার ৯৪৯ কোটি টাকা। সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার মাত্র ৩৮.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে প্রকৃত দরিদ্রের সংখ্যা বেড়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সম্প্রসারণই যেন দারিদ্র্য দূরীকরণের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, গত অর্থ বছরে ১৬ লক্ষ ৪ হাজার টন খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনীর কর্মসূচির আওতায় বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের কর্মসূচী দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশল হতে পারে না। 'একটি বাড়ি একটি খামার' ও ঘরে ফেরা কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সক্ষমতায় বাংলাদেশের অবনতি ঘটেছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দলীয় কমিটির মাধ্যমে নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে । কৃষি ও পল্লী জীবনে গতিশীলতা আনয়নের জন্য ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। কিন্তু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আমাদের দেশে ক্রমাগতভাবে দুর্বল হয়েছে, বর্তমান সরকারের আমলেও তা অব্যাহত রয়েছে।
কর্মসংস্থান নীতিমালা ঘোষণা ও বেকার সমস্যার সমাধান।	কর্মসংস্থান নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছে বলে আমরা শুনিনি। বেকারত্ব দূরীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো শিল্পখাতের প্রসার। কিন্তু জ্বালানী ও অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে শিল্প বিনিয়োগে আজ স্থবিরতা বিরাজ করছে।
৫ সুশাসন প্রতিষ্ঠা	
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার।	যুদ্ধাপরাধী/মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকর্মে লিপ্তদের বিচার প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে শুরু হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতার অভিযোগ উঠেছে।
বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা।	অতীতের ন্যায় দলীয় অনুগতদেরকেই বিচারবিভাগে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর ও জেলখানার চার নেতার হত্যাকাণ্ডের পুনর্বিচার।	বঙ্গবন্ধু হত্যার রায় কার্যকর করা হয়েছে, কিন্তু জেল হত্যা মামলার বিচারের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি।
২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও অপরাধীদের বিচারের	এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে।

ব্যবস্থা।	
সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ শক্ত হাতে দমন করা।	সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে কঠোরতা প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে কিছু অগ্রগতিও অর্জিত হয়েছে। জঙ্গীবাদের অভিযোগে অনেককে গ্রেফতার এবং বিচারের আওতায় আনা হয়েছে।
বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধ করা।	'ক্রসফায়ার' বা 'বন্দুকযুদ্ধ'র নামে বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের ওপর ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট-এর মানবাধিকার প্রতিবেদন (হিউমেন রাইটস রিপোর্ট) অনুযায়ী, ২০০৯ সালে ১২৯ জন ক্রসফায়ারে মৃত্যুবরণ করে। যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩ শতাংশ বেশি। বর্তমান বছরেও এ ধরনের মৃত্যু অব্যাহত রয়েছে।
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা	মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের ভাষ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে আইনের শাসন নেই। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। ছাত্রলীগের মতো লেজুড় সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীরা অন্যায় করে পার পেয়ে যাচ্ছে। সরকার স্থানীয় সরাকরের ক্ষেত্রে সংবিধান ও আদালতের নির্দেশ অমান্য এবং রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্ত (দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা ও অঙ্গ/সহযোগী সংগঠনের বিলুপ্তি) উপেক্ষা করেই চলছে।
স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন ও ন্যায়পাল নিয়োগ করা।	স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন পুনর্গঠন করা হয়েছে, যদিও কমিশনার নিয়োগে স্বচ্ছতা ছিল না এবং এ লক্ষ্যে সৃষ্ট কমিটি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেনি। ন্যায়পাল এখনও নিয়োগ করা হয়নি।
জাতীয় সংসদ কার্যকর ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।	জাতীয় সংসদে বিরোধী দল অনুপস্থিত এবং সরকারি দলের সদস্যরাও প্রতিপক্ষকে অশালীনভাবে ঘায়েল করার প্রচেষ্টায় এবং দলীয় প্রধানের বন্দনায় লিপ্ত। সংসদ সদস্যদের অনেকেই সংসদীয় কাজে বিমুখ – অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য এবং স্থানীয় উন্নয়ন কাজে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখছেন। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সৃষ্ট সংসদীয় কমিটি অনেকক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়, কিছু কমিটি তার এখতিয়ার বহির্ভূত কাজে লিপ্ত। কার্যপ্রণালী বিধি লঙ্ঘন করে কিছু কমিটিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যুক্ত হয়েছেন। কিছু স্পর্শকাতর বিষয়ে (যেমন, ছাত্র রাজনীতি, দলীয়করণ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলো নিরব। কিছু সংসদ সদস্য অসদাচারণ ও অপরাধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যেমন, মিথ্যা হলফনামা দিয়ে ১৮ জন সংসদ সদস্যের আবাসিক প্লট বরাদ্দের অভিযোগ পাওয়া গেলেও – যা একটি দণ্ডযোগ্য অপরাধ – তাঁদের বিরুদ্ধে সংসদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করার অভিযোগে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাই সংসদ সদস্যদের দায়বদ্ধতা আজ দারুণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ।
নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন পদ্ধতির চলমান সংস্কার অব্যাহত রাখা। প্রবাসী বাঙ্গালীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা। যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও মেধার ভিত্তিতে সব নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করা।	নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সংস্কার অব্যাহত রাখা হয়নি। বরং হয়েছে তার উল্টো। যেমন, *গনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) আইন* থেকে 'না' ভোটের বিধান বাদ দেওয়া হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রণীত অধ্যাদেশে দলের তৃণমূলের সদস্যদের সুপারিশের ভিত্তিতে (প্যানেলভূক্তদের মধ্য থেকে) সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন চূড়ান্ত করার বিধান পরিবর্তন করে তাদের সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে মনোনয়ন চূড়ান্ত করার বিধান করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রণীত স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কোনো অধ্যাদেশই নবম জাতীয় সংসদ অনুমোদন করেনি। পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ আইন থেকে প্রার্থীদের তথ্য প্রদানের বিধান রহিত করা হয়। সাংবিধানিক পদে বাছাই কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান সম্বালিত অধ্যাদেশ অনুমোদন করা হয়নি। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক গণমুখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা।	প্রশাসনে চরম দলীয়করণ চলছে এবং প্রশাসনকে গণমূখী করার লক্ষ্যে সংস্কারের কথা শোনা গেলেও অদ্যাবধি কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। যোগ্যতা, জেষ্ঠ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি এখনও হয় না। সাম্প্রতিক পাবনার ঘটনা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছে এবং প্রশাসনে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে।
পুলিশ ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখা।	আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির তেমন উন্নতি ঘটেনি। পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আগের মতোই দলীয় স্বার্থে এবং বিরোধীদের শায়েস্তা করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। (উদাহরণ, বিএনপির ডাকা ২৭ জুনের হরতালের দিনে মির্জা আব্বাসের বাড়িতে হামলা এবং পরবর্তীতে বিএনপি আয়োজিত মানববন্ধনে বাধা প্রদান।)
প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার সদস্য এবং সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতিবছর জনসমক্ষে প্রকাশ।	সম্ভবত বিষয়টির ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে এটি দ্বিতীয়বারের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তা বাস্তবায়নের জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।
রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলা।	এক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতিতো হয়ইনি বরং রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রতিশোধপরায়নতা ও অসহিষ্ণুতা বেড়েছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর হামলা ও নির্যাতন ব্যাপকহারে বেড়েছে, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নাটোরের সাম্প্রতিক ঘটনা, যেখানে উপজেলা চেয়ারম্যানকে দিনদুপুরে সরকারি দলের সন্ত্রাসীরা লাঠিপেটা করে হত্যা করেছে।
একটি আচরণবিধির প্রণয়ন।	একজন সংসদ সদস্য কর্তৃক একটি আইনের খসড়া সংসদে উত্থাপন করা হলেও, সরকারের পক্ষ থেকে এ লক্ষ্যে কোনো উদ্যোগই পরিলক্ষিত হয় না।
অন্যান্য অগ্রাধিকার	
স্থানীয় সরকার	
ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা	ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়নের কোনো উদ্যোগই পরিলক্ষিত হয় না। বরং সকল দলীয় ও সরকারি ক্ষমতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একদিকে সরকার প্রধান ও সংসদ নেতা,

পরিষদকে শক্তিশালী করা।	অন্যদিকে দল প্রধান, তাই তিনি পৃথিবীর ক্ষমতাধরদের অন্যতম। বহুদিন আগে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন এখনও অনিশ্চিত। সংসদ সদস্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় দলীয় ব্যক্তিরা অনেকক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদকে অকার্যকর করে ফেলেছে। উপজেলা পরিষদের ওপর সংসদ সদস্যদেরকে উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টার পরামর্শগ্রহণ বাধ্যতামূলক করে পরিষদের ওপর তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে, বিশেষত উপজেলা পরিষদকে সহযোগীতা না করার অভিযোগ উঠেছে। ঢাকা সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা নির্বাচন নিয়ে টালবাহানা অব্যাহত রয়েছে, যা *কুদরত-ই-এলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ* মামলার রায়ের পরিপন্থি। জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো উদ্যোগই লক্ষ্য করা যায় না, যা সংবিধান ও আদালতের রায়ের লঙ্ঘন। সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি তথা চেকস এন্ড ব্যালেন্সেস পদ্ধতি উপেক্ষা এবং হাইকোর্টের *আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বনাম বাংলাদেশ* মামলার রায় অমান্য করে স্থানীয় উন্নয়ন কাজে সংসদ সদস্যদের ব্যাপকভাবে জড়িত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে তাঁদেরকে ১৫ কোটি টাকা সমপরিমাণের উন্নয়ন প্রকল্প সুপারিশের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ফলে ভারতের পঞ্চায়েতীরাজের পরিবর্তে আমাদের দেশে 'এমপিরাজ' সৃষ্টির চেষ্টা চলছে।
ইউনিয়ন পরিষদ হবে উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু।	মেয়াদোত্তীর্ণ ইউনিয়ন পরিষদ এখন অনেকটা 'খোঁড়া হাঁসে'র সমতূল্য। ইউনিয়ন পরিষদকে সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার কোনো উদ্যোগই পরিলক্ষিত হয় না।
নারীর ক্ষমতায়ন	
জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা।	জাতীয় সংসদে নারী আসন বৃদ্ধির কোনো উদ্যোগ এখনও নেওয়া হয়নি। সম্প্রতি সংসদে একটি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন পাশ করা হয়েছে।
প্রশাসন ও সমাজের উচ্চপদে নারীদের নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।	প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে আরও কয়েকজন নারীকে পদায়ন করা হলেও, এ ব্যাপারে কোনো উল্লেখযোগ্য নীতিগত পরিবর্তনের কথা শোনা যায় না।
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য-প্রবাহ	
সকল প্রকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য-প্রবাহের অবাধ চলাচল সুনিশ্চিত ও সংরক্ষণ করা।	চ্যানেল ওয়ান এর সম্প্রচার বন্ধ, যমুনা টিভি অনুমোদন পায়নি। সংসদে পত্রিকার এবং টিভি সংবাদের সমালোচনা করা হয়েছে। আমার দেশের প্রকাশ বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও, আদালতের হস্তক্ষেপের ফলে তা কার্যকর হয়নি। তবে এর সম্পাদককে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। গণমাধ্যম ও প্রতিবাদী নাগরিকরা এখন মাননীয় সংসদ সদস্যদের প্রবল আক্রমণের মুখে।
তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ইগভর্নেন্স চালু করা।	তথ্য কমিশন পুনর্গঠন করা হয়েছে। তবে আইনটিকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্য তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। ডিজিটাল বাংলাদেশ সৃষ্টির ব্যাপারে সরকারের ব্যাপক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ই-গভর্নেন্স চালুর কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুত, অধিকাংশ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত তথ্য আপডেট করা হয় না।
পরিবেশ ও পানি সম্পদ	
নদী খনন, পানি সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রোধ, বনাঞ্চল ও জীব বৈচিত্র রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ।	নদী খননের কোনো উদ্যোগের কথা আমরা শুনিনি, যদিও ভারতের সাথে সাম্প্রতিক চুক্তির অধীনে কিছু কিছু নদী খননের উদ্যোগ নেওয়া এবং এ লক্ষ্যে কিছু ড্রেজার কেনার কথা শোনা যায়। পানি, বায়ু দূষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না। জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ যে ঝুঁকির সম্মুখীন তার সাথে খাপ খাওয়ানের কোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না, যদিও এ নিয়ে বছরখানেক আগে অনেক কথা শোনা গিয়েছিলো।
শিক্ষা ও বিজ্ঞান	
শিক্ষাঙ্গণ সন্ত্রাস বন্ধ ও সেশন জট মুক্ত করা।	শিক্ষাক্ষেত্রে বড় সফলতা একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন, যা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তেমন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ এখনও দেখা যায় না। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও সেসনজট অব্যাহত রয়েছে। বস্তুত, দলের ছত্র-ছায়ায় ছাত্রলীগ বেসামাল আচরণে এবং অপরাধী কার্যক্রমে লিপ্ত, কিন্তু ক্ষমতাসীন দল তাদের দায় নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছে।
স্বাস্থ্য	
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠিত ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা।	নতুন একটি স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো চালু করার উদ্যোগের কথা শোনা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, নির্বাচনের পর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে ভাষণ দেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, আমাদের সরকার হবে সকলের। আমরা ক্ষমতার অপব্যবহার করবো না। আমরা প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। আমরা হানাহানির রাজনীতি পরিহার করতে চাই। আমরা বিরোধী দলকে সংখ্যা দিয়ে বিচার করব না। আমরা

বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকারের পদ দেব। রাজি থাকলে বিরোধী দল থেকে মন্ত্রী করার ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করেন। তিনি দেশে এক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি উপহার দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এছাড়াও তিনি দারিদ্র্যকে 'সবচেয়ে বড় শত্রু' হিসেবে আখ্যায়িত করেন (*প্রথম আলো*, ১ জানুয়ারি, ২০১০)।

সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'আসুন, সব ভেদাভেদ ভুলে দেশের মানুষের জন্য একসঙ্গে কাজ করি। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলও রাষ্ট্র পরিচালনার অংশীদার। বিরোধী দলের ইতিবাচক সমালোচনা, পরামর্শ এবং সংসদকে কার্যকর করতে তাদের ভূমিকা ও মর্যাদাকে সমুন্নত রাখব।' তিনি দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'যেহেতু বিজয় অর্জন করেছি, তাই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে।' তিনি বলেন, বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা না হয়ে সংযত থাকতে হবে। জনসেবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু সরকারের মেয়াদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি পার হওয়ার পর এসকল অঙ্গীকারকে বহুলাংশে ফাঁকা বুলি বলেই মনে হয়।

পরিশেষে, নির্বাচনী ইশতেহার দলের পক্ষ থেকে জাতির কাছে একটি বড় অঙ্গীকার এবং এ অঙ্গীকার রক্ষায় আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো তাদের পবিত্র দায়িত্ব। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সফলতা যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়া শুরুর ক্ষেত্রে। বঙ্গবন্ধু হত্যার রায় বাস্তবায়ন এবং ২১শে আগষ্টের বর্বরোচিত ঘটনার পুনঃতদন্তও সরকারের সফলতার অংশ। এছাড়াও কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক ভর্তূকি প্রদান করা হয়েছে। একটি শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে, যদিও এটির বাস্তবায়ন এখনও বাকি। জঙ্গীবাদ দমনে সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে বড় সফলতা হলো সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তার বেষ্টনীর আওতায় ব্যাপকহারে খাদ্যশস্য বিতরণ, যদিও এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কৌশল হতে পারে না। সরকার জ্বালানী ও বিদ্যুতের সমস্যার সমাধানে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে কিছু সফলতাও অর্জিত হয়েছে। তবে এ সমস্যা সমাধানের জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষেও সরকার অত্যন্ত সচেষ্ট। সরকারের আরও অনেকগুলো সফলতা আছে, যা বহুলাংশে ধারাবাহিকতার সাফল্য। উদাহরণস্বরূপ, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসের কারণে সাম্প্রতিক এমডিজি সামিটে বাংলাদেশ একটি বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পুরস্কৃত এবং এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানো হলেও, এটি ছিল মূলত ধারাবাহিকতার সফলতা।

সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ার ক্ষেত্রে। বর্তমান সরকারের আমলে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তন তো হয়ই নি, বরং তার অবনতি ঘটেছে। প্রতিপক্ষের প্রতি অসহিষ্ণুতা ও প্রতিহিংসাপরায়নতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আরেকটি ব্যর্থতা হলো দুদককে শক্তিশালী করা এবং দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে। সরকার দ্রব্যমূল্যও স্থিতিশীল রাখতে এবং দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করতে পারেনি। আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার এবং প্রশাসনের দলীয়করণ অব্যাহত রয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা চরম। সকল সরকারি কার্যক্রম যেন দলীয় স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। দলতন্ত্র ও ফায়দাতন্ত্রের চর্চা, পশ্চাৎমুখীতা, শ্লোগান আওড়ানো, ব্যক্তিপূজা, গোষ্ঠীপূজা, মৃতের আরাধনা নিয়ে এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার প্রচেষ্টা যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। বিরাজমান অপশাসনের বর্ণনা দিতে গিয়ে সম্প্রতি বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেছেন, দেশ এখন বাজিকরদের হাতে। ভর্তিবাজি, নিয়োগবাজি, টেন্ডারবাজি, দলবাজি, মতলববাজির রকমফের দেখে মানুষ দিশেহারা।

সরাকরের এখনো দুই-তৃতীয়াংশ মেয়াদ বাকি রয়েছে এবং এটি আশা করা অযৌক্তিক হবে যে, এক-তৃতীয়াংশ মেয়াদকালে সরকার সবগুলো অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে। অনেকগুলো সমস্যা সমাধানের জন্য পুরো পাঁচ বছরের মেয়াদকাল, এমনকি তার বেশি সময়ও লাগতে পারে। তবে গত ২০ মাসে সরকার কতগুলো প্রাথমিক কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার বা জনগনের আস্থা অর্জনকারী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারতো। যেমন, ক্ষমতাধরদের সম্পদের হিসাব প্রদান, একটি আচরণবিধি প্রণয়ন, সরকারি দলের মদদে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি-দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, দলতন্ত্র ও ফায়দাতন্ত্রের চর্চার অবসান, দুর্নীতি দমন কার্যক্রমকে জোরদারকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সরকার এ সকল ক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে, ফলে ব্যাপকভাবে জনসমর্থন, বিশেষত তরুণ ও সচেতন নাগরিকদের সমর্থন হারিয়েছে, যদিও এরাই মহাজোট সরকারকে মহাবিজয় উপহার দিয়েছিল।

সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক হলো যে, দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নে সরকার যেন পরিকল্পিত ও প্রয়োজনীয় পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে পারেনি। এ জন্য কোনো 'ওয়ার্কপ্লান' বা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেনি। সরকার পারেনি দলের জেষ্ঠ্য নেতৃত্ব ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি মনিটরিং বা পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ও কাঠামো দাঁড় করাতে। এছাড়াও সরকারের প্রায় সব উদ্যোগই খণ্ডিত (piecemeal) ও অপরিকল্পিত (adhoc)। বস্তুত, সরকারের মেয়াদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও দিনবদলের সূচনাই হয়নি বলে অনেকের আশঙ্কা। কারণ দিনবদল মানে উল্লম্ফন বা আমুল পরিবর্তন। উপরন্তু সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কথাবার্তা থেকে মনেই হয় না যে, দিনবদলের সনদ বাস্তবায়ন এখন সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার – এটি যেন তাদের 'রাডার' থেকে সরে গিয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে অনেকগুলো ফ্রন্ট খুলে বসেছে এবং অনেকগুলো অপ্রাসঙ্গিক কুটতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।